‘দীর্ঘশ্বাসেরা হাওরের জলে ভাসে’ উপন্যাসের পাঠ-প্রতিক্রিয়া

মোশাহিদা সুলতানা

‘দীর্ঘশ্বাসেরা হাওরের জলে ভাসে’ উপন্যাসটি প্রথম পড়েছিলাম ২০১২ সালে। লেখক কিভাবে হাওরকে দেখেছিলেন সে সম্পর্কে জানার আগ্রহ থেকেই বইটি পড়েছিলাম। সে সময় মনে হয়েছিল, লেখক যে চরিত্রগুলো উপস্থাপন করেছেন তার পেছনের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করতে গিয়ে হাওরের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করেছেন অনেকটা প্রবন্ধের মতো। মনে হয়েছিল, একটা দীর্ঘ ফিকশনরূপী প্রবন্ধ পড়ে শেষ করলাম। এ রকম মনে করার কারণ অবশ্য ছিল পাঠক হিসেবে আমার নিজস্ব সীমাবদ্ধতা। অর্থাৎ আমি তা-ই পড়তে চাইছিলাম, যা আমি আশা করছিলাম। কিন্তু পড়ার পর কয়েকটি বর্ণনা, বিশ্লেষণ, মানুষের বেঁচে থাকার আকুতি, লড়াইয়ের উপাখ্যান, অজানা এক জলভূমিতে মানুষের জীবনধারার রূপান্তরের যে চিত্র আমার ভেতরে নাড়া দিয়েছে, তা দেখা গেল ভোলা যাচ্ছে না। অর্থাৎ আমার জানা না জানার বাইরেও এক শক্তি নিহিত আছে এই লেখায়, যা আমাকে নাড়া দিয়ে গেছে। আর এই শক্তিকে অস্বীকার করার শক্তি আমার নেই।

এরপর পাঁচ বছর কেটে গেল। এর মাঝে অনেক কিছুই পরিবর্তন হয়েছে। ২০১৭ সালে এসে একে একে খবর আসতে লাগল–পানির ঢলে ভেসে গেছে হাওর, মাছের মড়ক লেগেছে, হাঁস-মুরগি মরতে শুরু করেছে। আর এদিকে উন্নয়নকর্মী, গবেষক, নীতিনির্ধারক মহল কৃষকদের ঋণ মওকুফ করা নিয়ে কথা বলছেন অথবা স্থায়ী সমাধান নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সময়মতো বাঁধ নির্মাণের বাইরে গিয়ে হাওরের প্রতিবেশের বৈচিত্র্যকে ও এর সংকটের বৈচিত্র্যকে ঠিক বুঝে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে আনতে পারছেন না। আর সামগ্রিকভাবে হাওরকে বোঝার এই ব্যর্থতা আমার মধ্যে একটি শূন্য অনুভূতি তৈরি করলো। মনে পড়ে গেল মাসউদুল হক নামে আমার না-চেনা এক লেখকের সেই উপন্যাসের কথা–‘দীর্ঘশ্বাসেরা হাওরের জলে ভাসে’।

দীর্ঘশ্বাস ফেলেই বইটি আবার ওল্টালাম এমন একটি দিনে, যেদিন কাশেম বিন আবু বাকার নামে একজন লেখকের জনপ্রিয়তা নিয়ে একটি বিদেশি পত্রিকা রিপোর্ট করেছিল। এই লেখকের লেখার মূল উপজীব্য বিষয় হচ্ছে গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে ইসলামকেন্দ্রিক প্রেম-ভালোবাসা। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে যখন হেফাজতে ইসলামের দাবি মেনে নিয়ে সরকারপক্ষ বিভিন্ন ধরনের কারসাজি করে পাঠ্যপুস্তক থেকে বাংলাদেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেখকের গল্প-কবিতা বাদ দিয়ে সাম্প্রদায়িকতাকে উসকে দিচ্ছে, তখন কাশেম বিন আবু বাকারকে নিয়ে করা রিপোর্টটি অনেকটা সাম্প্রদায়িক উসকানি নির্ভর আলোচনায় লেখক-বুদ্ধিজীবী মহল ও সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যস্ত করে রেখেছে। মনে আছে হাওরের বিপর্যয় থেকে নিমেষেই এ দেশের বহু সচেতন নাগরিকের মগজ এই কাশেম বিন আবু বাকারের লেখনীর প্রতিক্রিয়া পাঠের দিকে ধাবিত হলো। যেন অনেক দিন পর মুখ বন্ধ করে থাকা বুদ্ধিজীবী মহল একটা অবকাশ পেয়ে গেল কথা বলার। সে সময় আমার মনে হলো, আজকে কথা বলার কথা ছিল মাসউদুল হকের উপন্যাস ‘দীর্ঘশ্বাসেরা হাওরের জলে ভাসে’ নিয়ে। কিন্তু আজকে মনোযোগ অন্যদিকে। এর কারণ শুধু আমাদের পাঠক মহলের ব্যর্থতাই নয়, আমাদের লেখক মহলের এবং প্রকাশক মহলের ব্যর্থতাও। অর্থাৎ আমরা সময়মতো সময়ের লেখাগুলো মানুষের কাছে নিয়ে যেতে অক্ষম। বলতে গেলে লেখক হিসেবে আমি এক ধরনের দায়বদ্ধতা নিয়েই, হাওরের জন্য এক ধরনের হৃদয়ের টান অনুভব করেই এই লেখাটি লিখতে বসেছি।

আগেই বলেছি, এ বইটি নিয়ে ভাবতে গিয়ে আমি লক্ষ করেছি, এর সাহিত্যমূল্য নিয়ে, ভাষার ব্যবহার নিয়ে, ঘটনার বিশ্লেষণে লেখকের পারদর্শিতা নিয়ে কথা বলতে গেলে বইটি সম্পর্কে আলোচনা স্থবির হয়ে যাবে। বা লিখলেও অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। আমার কাছে যে দিকটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে এসেছে তা হলো, হাওরের এই মানুষগুলোকে খুব কাছ থেকে দেখার ও বোঝার চেষ্টা এখানে রয়েছে। দূর থেকে আমরা যারা হাওরকে চিনি, আমাদের কাছে হাওর একেবারেই অসম্পূর্ণভাবে বোঝা একটি অঞ্চল। বিশেষ করে এর প্রাণবৈচিত্র্য, অভিবাসন প্রক্রিয়া, জীবিকা নির্ভরতা, পরিবেশ প্রতিকূলতা ও সামাজিক বিন্যাস পুরো অঞ্চলের উন্নয়ন ধারণার সাথে কতটা সম্পৃক্ত তা বোঝা যাবে এই উপন্যাসটি পড়লে। লেখক এমন সব বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছেন, যা সেই অঞ্চলের মানুষের সাথে গভীর যোগাযোগ না থাকলে উপন্যাসে উঠিয়ে আনা সম্ভব নয়। এই উপন্যাসের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে যে কয়টি চরিত্র ঘিরে ও তাঁদের রূপান্তরের মাধ্যমে, তাঁরা হলেন একজন স্কুল শিক্ষক আফাজ মাস্টার, ধরমপাশা থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ডাক্তার আতিকুর রহমান, ক্ষুদ্র কৃষক তবারক, দাদন ব্যবসায়ী আখের মিয়া, সোনালী ব্যাংকের ক্লার্ক কুদ্দুস, ওয়াটার লর্ড আয়নাল, তাজুল চেয়ারম্যান, গরিব জেলে সফদর এবং আরো অনেকেই। বলা ভালো, এখানে লেখক দু-একটি চরিত্র বাদে কোনো চরিত্রের খুব ভেতরে গিয়ে তাকে নাড়াচাড়া করেননি। এ রকম আশা করলে হতাশ হতে হবে। তবে চরিত্রকে সেই অর্থে নির্মাণ না করেও যে ঘটনা এগিয়ে নেয়া যায় এবং পড়ার সময় তাদের গল্পগুলোর সাথে সম্পৃক্ততা বোধ করা যায় তা সফলভাবে লেখক করে দেখিয়েছেন এই উপন্যাসটিতে। অর্থাৎ আমি বলতে চাই, লেখক এখানে তাঁর নিজস্বতাকে ব্যবহার করেছেন। নিজস্ব একটি শৈলী তিনি অনুসরণ করেছেন। এর মধ্যে একটা সরলতা আছে, তীব্র আবেগ আছে। এই অনুভূতিগুলো পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় অনুভব করা যায়।

এই অঞ্চলের মানুষের সুখ-দুঃখ বোধ এককভাবে নিয়ন্ত্রিত কোনো কিছুর অভাবের কারণে হয় না। লেখক এই অভাবের ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিজেই এক জায়গায় লিখেছেন, ‘যদিও অভাব বহুরূপী ধারণা। এক-এক মানুষের কাছে এক-এক রূপে ধরা দেয়।...সে অভাব অজগর সাপের মতো শিকারকে জাপটে ধরে মোচড় মারা অভাব। হাওরের মানুষ তাই ঘুম না আসা মানুষের মতো এপাশ-ওপাশ করে জন্মাবধি জীবন যাপন করে। অবশ্য জীবনযাপন কথাটা হাওরের মানুষের জন্য প্রযোজ্য নয়। সচ্ছল মানুষেরা জীবন

যাপন করে, গরিবরা জীবন পার করে।' অভাবের এমন চিত্র প্রাবন্ধিক ভাষায় স্বগতোক্তির মাধ্যমে তিনি যখন তুলে ধরেছিলেন তখন মনে হয়েছিল, এটা কি প্রবন্ধ পাঠ, নাকি উপন্যাস পাঠ। কিন্তু উপন্যাসের ভেতর ঢুকে যখন তিনি এর চুলচেরা বিশ্লেষণে গেলেন বিভিন্ন চরিত্রের জীবনের গল্পের মধ্য দিয়ে তখন বোঝা গেল তার এক জায়গায় উল্লেখ করা স্বগতোক্তি কোনোভাবেই চরিত্র, চরিত্রের কার্যবিধির প্রেক্ষাপট থেকে আলাদা করা সম্ভব না। যেন ঠিক এই বর্ণনারই প্রয়োজন ছিল। "তবারক গত ক'দিন ধরেই বাজার ফেরত লোকজনের কাছে জানতে চাইছে, সারের খবর কি? কেউ কিছু বলতে পারে না। ভাতিজাকে দেশি জাতের ধান লাগানোর কথা বললেও যতই বীজ বুনার সময় এগিয়েছে, নিজেই ততো সংশয়ে পরে গিয়েছে। শেষে নিজে এক কানি জমিতে দেশি ধান আর এক কানি জমিতে উফশী ধান লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার আশা, যদি আগাম বন্যা আসেও তবু দেশি জাতের ধানটা ঘরে তুলে ফেলতে পারবে। এতে করে অন্তত ক্ষুধার যন্ত্রণা থেকে পরিবারটাকে বাঁচাতে পারবে, ভেবে খানিকটা দুশ্চিন্তামুক্ত হয়। আর ভাগ্য ভাল থাকলে, যদি পানি আসার আগে আগে উফশী ধানটাও ঘরে তুলে ফেলা যায়, তবে তো কথাই নেই। ঠিক ঠিক এবার মেয়েটাকে লাল গাভী কিনে দিবে একটা।"

উদ্ধৃত অংশটি থেকে দেখা যায় লেখক এখানে শুধু বীজের অভাব, সারের অভাবের মধ্য দিয়েই অভাবকে বোঝাতে চাননি, তিনি এর মধ্য দিয়ে একটি গল্পও হাজির করেছেন, যে গল্পে আমরা দেখি কিভাবে ক্ষুদ্র কৃষক তবারক এই বৈরী আবহাওয়ার সাথে লড়াইয়ের অংশ হিসেবে আগে ঘরে তোলা যায় এমন দেশি ধানের বীজ জোগাড় করছেন। আমরা যারা দূর থেকে ভাবি কৃষকেরা নিজেরাই জেনেশুনে বেশি ফলনের আশায় ঝুঁকি নিয়ে উফশী ধান লাগায় তারা ভাবি না কৃষকেরা এসব মাথায় রেখেই অর্ধেক জমিতে দেশি ধান আর অর্ধেক জমিতে উফশী ধান বোনে। এই একই অধ্যায়ে রাতের অন্ধকারে দেখা যায় নিজের এলাকায় সারের অভাবের কারণে কিভাবে সেই দরিদ্র কৃষক অন্য জেলা থেকে সার কিনে আনতে বাধ্য হয়। এই যে সারের অভাব তৈরি করা হলো তার কারণ ঘাঁটতে গেলে দেখা যাবে মুনাফাখোর সার ব্যবসায়ীদের কারসাজিই মূল কারণ। এই একই অধ্যায়ে আরো দেখা যায় তবারক কিভাবে ধান বোনার সময় সরকারি বীজের কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট অভাবের শিকার হয়ে বারহাট্টা থেকে বীজ সংগ্রহ করতে বাধ্য হয়। একটি সমস্যার গভীরে গিয়ে যে একটি গল্পকে এমনভাবে হাজির করা যায় তা প্রায় প্রতি অধ্যায়েই লেখক করেছেন সুনিপুণভাবে। এ রকম হাওর অঞ্চলের একজন কৃষক মনিরুদ্দীনকে হুমায়ূন আহমেদ হাজির করেছিলেন তাঁর উপন্যাস 'অপরাহ্ন'তে। সেই কৃষকের ব্যক্তিগত জীবনে বীজ বা সারের অভাবটা মোটাদাগে একটা অভাব হিসেবেই এসেছে। নিজের বৌয়ের ভাইকে পাঞ্জাবি কিনে দিতে না পারার কষ্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ সেই অভাব নিশ্চয়ই আমাদের মনে অন্যভাবে দাগ কেটেছে। কিভাবে তিলে তিলে একজন কৃষক নিজের বসবাসের জন্য একটি ঘর বানায়, কিভাবে হাওরের বিশেষ বাস্তবতা, যেমন–সাপের কামড় আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা থেকে দূরে থাকা হাওর অঞ্চলের দরিদ্র মানুষদের নিরাপত্তাহীন করে তোলে সেই গল্প হুমায়ূন আহমেদ আমাদের বলেছেন। হাওর অঞ্চলের প্রেক্ষিতে লেখা হুমায়ূন আহমেদের এ উপন্যাসটিও শক্তিশালী কিন্তু ব্যক্তিকেন্দ্রিক একটি বিশ্লেষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। আমি বলছি না এই সীমাবদ্ধতা থেকে বের হয়ে এলেই কোনো লেখা সর্বোৎকৃষ্ট হয়ে উঠবে। বরং আমি বলছি কাদায় আটকে যাওয়া একটা হাঁসের ছবি আর কাদায় আটকে যাওয়ার আগে বৃষ্টির ইতিহাস সমেত, পানি নেমে যাবার ইতিহাস সমেত একটি হাঁসের ছবির মধ্যে যে বিস্তর ফারাক সেই ফারাকটা ধরা পড়ে মাসউদুল হকের লেখা পড়তে গেলে। আর এই বিষয়গুলো আনতে গেলে যে প্রেক্ষাপটের বিশ্লেষণ প্রয়োজন সেটা করার কারণেই সম্ভবত প্রথম দিকে এ উপন্যাসটি আমার যেমন মনে হয়েছিল, পরের বার পড়ার সময় আর তেমন মনে হয়নি। মনে হয়েছে এই বিশ্লেষণই প্রয়োজন ছিল।

এ উপন্যাসে হাওর অঞ্চলে দাদন ব্যবসার স্বরূপ উপস্থাপন করতে গিয়ে লেখক ব্যাংকের একজন কর্মচারীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় জীবনকেই টেনে এনেছেন। পড়ার সময় আমার মনে হয়নি লেখক উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমার মতো পাঠকদের জ্ঞানদান করতে গিয়ে বিশেষভাবে এ বিষয়টি এনেছেন। উপন্যাসে দাদন ব্যবসায়ীর চরিত্র তুলে ধরতে গেলে অনেকভাবেই ধরা যেত, কিন্তু এখানে লেখক তাঁর নিজস্ব ধরনে এটি করেছেন বলে এর মধ্য থেকে অনেক সত্য উঠে এসেছে। অংশটুকু আমি উদ্ধৃত করছি–

> দূর থেকে আমরা যারা হাওরকে চিনি, আমাদের কাছে হাওর একেবারেই অসম্পূর্ণভাবে বোঝা একটি অঞ্চল। বিশেষ করে এর প্রাণবৈচিত্র্য, অভিবাসন প্রক্রিয়া, জীবিকা নির্ভরতা, পরিবেশ প্রতিকূলতা ও সামাজিক বিন্যাস পুরো অঞ্চলের উন্নয়ন ধারণার সাথে কতটা সম্পৃক্ত তা বোঝা যাবে এই উপন্যাসটি পড়লে। লেখক এমন সব বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছেন, যা সেই অঞ্চলের মানুষের সাথে গভীর যোগাযোগ না থাকলে উপন্যাসে উঠিয়ে আনা সম্ভব নয়।

"কুদ্দুস সামান্য ক্লার্ক হিসাবে সোনালী ব্যাংকে যোগ দিয়েছিল। সেখান থেকে প্রমোশন নিতে নিতে এখন ম্যানেজার। মদ, টাকা আর নারীসংগ ছাড়া থাকা তার পক্ষে কঠিন। প্রথমদিকে কষ্ট হলেও, এখন প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো জোগাড় করে ফেলেছে। বাড়িতে যাওয়ার প্রতি আগ্রহ কম। তবে সময়মতো টাকা পাঠাতে ভুলে না। পরিবার থেকে যখন যে চাহিদার কথা জানানো হয় তখন সেই চাহিদাটাকে টাকায় হিসাব করে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে বন্ধের দিনে ময়মনসিংহ কিংবা গাজীপুর পর্যন্ত চলে যায় আমোদ-ফুর্তির জন্য। তবে নিজের পয়সায় না, ভাল গ্রাহকদের পয়সায়। আব্দুল কুদ্দুসের ধরমপাশায় আগমনে ধরমপাশায় ব্যবসার প্রসার ঘটে গেছে।

নিজেই কাগজপত্র তৈরি থেকে শুরু করে উপরের অফিস পর্যন্ত দৌড়াদৌড়ি–সবকিছু করে লোন অনুমোদন করিয়ে দেয়। সবকিছু চলে প্যাকেজ প্রোগ্রামে। বিনিময়ে লোনের টাকার একটা অংশ তাকে দিয়ে দিতে হয়। এ ব্যবস্থায় ব্যবসায়ীরাও খুশী। কাগজপত্র তৈরিতে যে ঝক্কি-ঝামেলা তা থেকে রেহাই পাওয়া মানে হাতে চাঁদ পাওয়া। বিশেষ করে কৃষিঋণ ছাড়ার সময় তার ব্যবসা রমরমা। নিজেই গ্রাহকদের জানান দেয়, সরকারি টাকা ফেরত দেওয়ার দরকার কি? কুদ্দুসের উদারতা প্রথমদিকে আখের ভাল চোখে দেখেনি, এত সহজে লোকজন টাকা পেয়ে গেলে সে দাদন দিবে কাকে? পরে অবশ্য আখেরের ভুল ভেঙে যায়। কুদ্দুস আখেরকে কৃষিঋণ তোলার সহজ পথ বাতলে দেয়। নিজের বাড়ির কামলা থেকে শুরু করে দূরের-কাছের আত্মীয়স্বজনের দলিল জমা করে টাকা তুলে নিয়েছে আখের। এর মধ্যে আবার বেশকিছু জাল দলিলও আছে। কৃষিঋণের

টাকা নিয়ে আখের তা আবার অন্য অভাবীদের কাছে দাদন হিসেবে দিয়ে ভাল একটা ব্যবসা করে ফেলেছে গত এক বছরে।"

এই বিশেষ অংশটি যেদিন বই উল্টে হঠাৎ আবার চোখে পড়ল, সেদিন খবরের কাগজে হাওরের বিপর্যয়ের সমাধান হিসেবে কৃষকদের ঋণ মওকুফের কথাটি বিজ্ঞজনেরা, এনজিওকর্মীরা বলে যাচ্ছিলেন। ক্ষুদ্র কৃষকের ঋণ মওকুফ জরুরি কিন্তু ব্যাংকের ঋণ মওকুফ হলেই কি তবারকের মতো ক্ষুদ্র কৃষকেরা অভাব কাটিয়ে উঠে নতুনভাবে জীবন শুরু করতে পারবে বিপর্যয়ের পর? নিশ্চয়ই লেখক যে চরিত্র নির্মাণ করেছেন তার ব্যতিক্রম অনেক কিছুই আছে, কিন্তু এই বিষয়গুলো জানা না থাকলে, গভীরে গিয়ে সামাজিক বাস্তবতাগুলো না বুঝলে খুব দ্রুতই যে কোনো সমাধান প্রস্তাব করা যায়। কিন্তু সমাধানের দিকে এগুনো সম্ভব হয় না।

এ উপন্যাসে আরেকটি শক্তির জায়গা হল এখানে হাওরের রাজনৈতিক অর্থনীতির বিষয়টি ঘটনাপ্রবাহের সাথে সাথে সমান তালে চলতে থাকে। হাওর তার সমস্ত প্রতিকূলতা নিয়ে প্রতিবছর নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেও সেখানকার অর্থনীতিকে শুধু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করলে হয় না। লেখক এর বাইরে গিয়ে এর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দিকটিও হাজির করেছেন। নিচের দুটি উদ্ধৃত অংশ থেকে তা বোঝা যাবে–

"হাওরের সাধারণ মানুষেরা 'জলমহাল' বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না, জলমহালকে বলে বিল। আবার জলমহাল বললে বিশালত্ব যেমন প্রকাশ পায়, বিল বললে তা পায় না। যদিও বিল বলতে হাওরের সেসব নিচু জায়গাকে বোঝায়, যেখানে শুকনার সময়েও কিছুটা পানি জমে থাকে; তথাপি কেন যেন হাওরের মানুষের কাছে জলমহাল মানেই বিল। প্রতিবছর পানি নেমে যেতে শুরু করলে হাওর অঞ্চলে মাছ ধরার ধুম পড়ে। হাওর থেকে যেসব পথ দিয়ে পানি নেমে যায় সেসব পথ এসময়ে জাল দিয়ে আটকানো থাকে। পানি নেমে যায়, কিন্তু মাছেরা থেকে যায়। মাছেদের থেকে যেতে হয়। মাছেদের নিজেদের জালে বেশি করে তুলে নিতে বিলের সীমানা নিয়ে তখন ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকে। প্রত্যেকেই যার যার নিজের সীমানা বাড়িয়ে নিতে লিপ্ত হয়। আগে এসময় দু'চারটা লাশ পড়া ছিল মামুলি ব্যাপার। এখন সময় বদলে গেছে। টাকা-পয়সা দিয়ে ম্যানেজ করে চলছে সব। টাকার জোর আর রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে এলাকাভিত্তিক দু'একজন ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে সব বিল। রাজনৈতিক পালাবদলেও ক্ষমতাবানরা তেমন ক্ষতির সম্মুখীন হয় না। বড় কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হলে ঢাকায় চলে যায়। কোর্ট থেকে ইনজাংশন নিয়ে আসে। বিচারকরা ঢাকায় বসে সিদ্ধান্ত দেয়। তাই একবার বিলকে দখলে নিলে তার কাছ থেকে তা অন্যের দখলে নেয়া কঠিন। যেনতেন উপায়ে তা যুগের পর যুগ ধরে রাখতে জলমহালের মালিকেরা যেন বদ্ধপরিকর। এক-একটা বিল যেন এক-একজন ইজারাদারের জমিদারি। জীবন থাকতে সে জমিদারি হাতছাড়া করতে কেউ চায় না। তাজুল চেয়ারম্যানের বয়স চল্লিশ পার হলেও এখনও তাদের বিভিন্ন সমবায় সমিতির নাম দিয়ে নেয়া জলমহালগুলোর নিয়ন্ত্রণ তাদের বাবা আয়নালের হাতে। আয়নালকে জলমহালের ইজারাদার না বলে ওয়াটারলর্ড বলে সম্বোধন করলে তিনি বেশি খুশি হন। আয়নাল ও তার পরিবারের নিয়ন্ত্রণে ঘাসিগাং, টেপাইরবিল, শয়তানখালি, ধানকুনিয়ার গ্রুপ ফিসারিজসহ আরো দশটি ছোটবড় বিল আছে।

বিশ একরের উর্দ্ধে জলমহালগুলো সুনামগঞ্জ ডিসি অফিস থেকে ইজারা আনতে হয়। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে দফায় দফায় মিটিং হয় ক্ষমতাসীন নেতার বৈঠকখানায়। সারা জেলার জলমহাল কে কোনটা নিবে, কে কত টাকা ছাড় দিবে–এইসব প্যাকেজ নিয়ে বিরাট হুজ্জত চলে। তাজুল চেয়ারম্যান চেয়ারম্যানি নিয়ে ব্যস্ত বেশি। তার বড় ভাই কুতুবের বুদ্ধি বেশি, পড়াশোনাও বেশি। সুনামগঞ্জ শহরের রাজনৈতিক নেতার বাসার দেন-দরবার সেই করে। মূল কাজ শেষ হলে মারামারি, ঝগড়া-বিবাদ পাহারা দেয় এইসব মাঠ পর্যায়ের কাজে পিতা আয়নালের সহযাত্রী হয় তাজুল চেয়ারম্যান...তারপরেও অন্য এলাকার মানুষেরা যখন স্বপ্ন দেখে তাঁর ছেলেমেয়েরা ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হবে, হাওর অঞ্চলের মানুষ স্বপ্ন দেখে, তার সন্তান জলমহালের মালিক হয়ে ট্রলারে করে বিল থেকে বিলে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এভাবে স্বপ্ন দেখে বড় হওয়া কত মানুষ যে ওয়াটারলর্ড না হতে পেরে লাশ হয়ে হাওরের জলে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তার কোনো হিসাব নেই। যতই দিন যাচ্ছে জলাভূমির উপর থেকে হাওরের সাধারণ মানুষের নিয়ন্ত্রণ কমতে কমতে শূন্যের কোঠায় নেমে যাচ্ছে..."

"আতিক আবার দ্বিধা নিয়ে জানতে চায়, 'সব জলমহাল যদি ইজারা দিয়ে দেয়া হয় তাহলে সাধারণ জেলেরা কি করে বেঁচে আছে?'
তোফা কথার জবাবে বলে, 'সাধারণ জেলে অহন আর তেমুন নাই। হেরা জলমহালের মালিকগো বিলে মাছ দইরা দেয়, বিল পাহারা দেয়। পেশা ছাইড়া দিতাছে আস্তে আস্তে। তবে বেশি ক্ষতি হইছে কৃষকগো। হেরা বর্ষার সম ঐ বিলে মাছ মাইরা খাইতো। এহন আর পারে না।'
আতিক জানতে চায় ,'পারে না কেন?'

তোফা বলে যায়, বর্ষায় যখন পানি চলে আসে তখন আর ধানের জমি থাকে না। সব চলে যায় পানির নিচে। জলমহালগুলোর আর কোনো সীমারেখা থাকে না। সব জলমহাল আর কৃষিজমি একাকার হয়ে যায়। তখন জলমহালের মালিকেরা ইজারা নেয়া বিলের সীমানা মানে না। যতদূর চোখ যায় ততদূর হয় তার জলমহালের সীমানা।

এমন অবাক কথা শুনে হায় হায় করে উঠে আতিক, বিস্ময় নিয়ে বলে, 'কি বলেন? দেশে কি আইনকানুন নেই? যা ইচ্ছা তা করে যাবে?'

তোফা শুনে আবার হাসে, 'দেশে আইনকানুন হয়তো আছে কিন্তু আবার নাইও। সরকার বলছে, জলমহাল ইজারা পাইবো শুধু জেলেগো সমিতি। ব্যস, কাম হারছে, গাড়িওয়ালা-বাড়িওয়ালা সবাই মৎস্যজীবী অইয়া সমিতি খুইলা ফেলে। কাগজে-কলমে মৎস্যজীবী নাম নেওয়া লোকের সংখ্যা এত বেশি যে গরিব জেলেরা এহন আর সমিতি বানায় না।'

আতিক চা আনতে বলে। হাসপাতালের এক কর্মচারী চা এনে তোফার সামনে রাখে। তোফা খুব তৃপ্তি নিয়ে চায়ে চুমুক দেয়। আবার শুরু করে, 'ধরেন আপনার জমিন, আপনে প্রত্যেক বছর চাষ করেন। রেকর্ডে আপনের নাম। কিন্তু যেই বর্ষায় পানি আইসা পড়বো জমিতে আর আপনের অধিকার থাকবো না। ঐ জমির পানিতে আপনি আর মাছ ধরতে পারবেন না।'

আতিক আরো বিস্মিত হয়, 'এত অবিচার! মানুষ কিছু বলে না?'
তোফা হাসে, 'একবারই বলছিল, একবারই প্রতিবাদ করছিল, ফল না পাইয়া এহন চুপ মাইরা গেছে।'

আতিকের কৌতূহল আরো বাড়ে। একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার মনোযোগী শ্রোতা হয়ে উঠে। তোফা শুরু করে ভাসান পানি আন্দোলনের ইতিহাস।...মূল দাবি ছিল বৈশাখ থেকে কার্তিক মাসে যেখানে ভাসান পানি থাকবে সেখানে মৎস্যজীবীরা অবাধে মাছ ধরতে

পারবে।...আন্দোলনের বিকাশকাল ছিল ১৯৮৪-১৯৮৭ সময়কাল। হাওরে তখন ইজারাদার আর সংগঠিত জনগণের সংঘর্ষ ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। এরপর ব্যাপক ধরপাকড় আর নেতাদের বিচ্যুতির কারণে কোনো আইনগত স্বীকৃতি ছাড়াই আন্দোলন ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসে।"

লেখক সফদরের মতো দরিদ্র জেলেদের জীবনের দিকেও আলোকপাত করেন। সফদরের মতো জেলেরা রামসার সাইট হিসেবে ঘোষিত টাঙ্গুয়ার হাওরে মাছ ধরার অপরাধে আসামি হয়ে পরিবার-পরিজনকে অভাবের মুখে ফেলে দিয়ে দিনের পর দিন জেল খাটতে বাধ্য হন। তাদের মনে হয় ডাকাত হলেই ভালো ছিল। বই থেকে একটি অংশ তুলে ধরছি–

"সফদররা সাতজন দিনের পর দিন জেলে পড়ে থাকে। কি করে জেল থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে তা তাদের অজানা। আরও বেশী অজানা বাড়িতে রেখে আসা স্ত্রী-পুত্রদের। সফদরদের পরিচয় হয় নানারকম মানুষদের সাথে। সাথের আসামীরা যখন জিজ্ঞেস করে, 'কি আকাম করছিলা?'

সফদরেরা তখন এ ওর মুখের দিকে চায়। কেউ একজন হয়তো আস্তে বলে, 'মাছ দরছিলাম।'

তখন অন্য আসামীরা বিরক্ত হয়, 'মাছ দরলে কি কারো জেল হয় নাহি? নিশ্চয় ডাকাতি করতে গেছলা?'

সাথের কয়েদিরা তাল দেয়, 'হ হ, ডাকাতিই করতো গেছিন।' সফদরদের মনে হয় ডাকাতি করাই ভাল ছিল। ডাকাতি করলে যেমন বিচার, মাছ চুরিরও একই বিচার। কিছুদিন পর সফদরদের সাথে জেলে ঢুকা জয়নাল ডাকাতেরও জামিন হয়, কিন্তু সফদরদের জামিন হয় না।"

টাঙ্গুয়ার হাওরে মাছ ধরা নিষেধ সত্ত্বেও গরিব জেলেরা উপায়হীন হয়ে মাছ ধরায় তাদেরকে যখন কারাগারে দিন কাটাতে হয় তখন নৌকার মালিক ঠিকই নিজ জিম্মায় নৌকা নিয়ে নিতে সক্ষম হন। "সফদররা জেলে পচে মরলেও নৌকা আবার জলে নেমে পড়ে।" পরবর্তীতে দেখা যায় সফদর কারাগার থেকে বের হয়ে দেখে "টাঙ্গুয়ার হাওরে এখন মাছ ধরতে হলে হাওর পাহারা দেয়া ওইসব আনসার- পুলিশদের নৌকাপ্রতি টাকা দিতে হয়। টাকা দিলেই সব ঠিকঠাক।"

পানি উন্নয়ন বোর্ডের দায়িত্ব হওয়া সত্ত্বেও বাঁধ মেরামতের কাজ যে শেষ পর্যন্ত স্থানীয় মানুষেরাই নিজের স্বার্থে করে থাকে আর ঠিকাদারেরা প্রভাব খাটিয়ে ঠিকাদারি নিয়ে নামেমাত্র কাজ দেখায় তার একটি চিত্র দেখতে পাই এই নিচের কিছু অংশে–

"জমিতে সার দিয়ে গিয়ে তবারক দেখে ঘূর্ণির বাঁধের পাশে একদল লোক জমা হয়েছে। তারা পাশের জমি থেকে মাটি কেটে এনে বাঁধের উপর ফেলছে। পাশের গ্রামের আসলাম শেখের ছেলে ফরিদ তদারকি করছে বাঁধের কাজের। কৌতূহল নিয়ে ফরিদকে জিজ্ঞেস করে তবারক, 'এইবার বাঁধের কাম কি তুই লইছস?'

ফরিদ বলে, 'না, না, আমি লই নাই। ঠিকাদারি লইছে সিলেটের এক নেতা। তারতে সাবকন্টাক লইছে সুনামগঞ্জের ছাত্রনেতা মুক্তাদির ভাই। হেরে আবার কিছু টেকা দিয়া সাবকন্টাক লইছে ধরমপাশার নেতা খসরু ভাই। হে এত দূর আইতে না পাইরা আমারে তদারকির কাম দিছে।'

তবারক জানে এমনই হয় প্রতিবছর। এ বছর যে সময়ে কাজ ধরছে তাতে বৈশাখের আগে বাঁধ তৈরি করা সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ আছে। আর বাঁধে যখন ভাঙ্গন ধরবে তখন সিলেটের ঠিকাদারকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবারকদের কান্না সুনামগঞ্জের পানি উন্নয়ন বোর্ড অফিস পর্যন্ত পৌঁছে না, আর সিলেট তো আরো দূরে। গত একশ বছরেও নদী কখনও খনন হয়নি। নদীর তলদেশে পলি পড়ে পড়ে উচ্চতা বেড়ে গেছে। বাঁধের উচ্চতা সে অনুযায়ী বাড়েনি। এ বাঁধের মাপজোক করতে কেউ আসে না। তারপরও প্রতিবছর টেন্ডার হয়, ঠিকাদার আসে। তারা কাজ শেষ করে বিল তুলে নিয়ে যায় আর বাঁধে ফাটল ধরলে রাত জেগে ফাটল বন্ধ করতে হয় তবারকদের নিজেদেরই।"

প্রথমবার যখন এই উপন্যাসটা পড়েছিলাম আমার মনে হয়েছিল, লেখক এখানে জ্ঞান দেয়ার উদ্দেশ্যে এ রকম একটি পরিস্থিতি সচেতনভাবে তৈরি করেছেন। কিন্তু পরের বার যখন আবার পড়লাম তখন জ্ঞানদান করলে অসুবিধা কি–এ রকমটাই মনে হয়েছে। অর্থাৎ লেখক যে কৌশলগুলো ব্যবহার করেছেন তা সহজেই বোধগম্য এবং বিভিন্ন জায়গায় মনে হয়েছে, তিনি খুব দ্রুত এই বর্ণনাগুলো দিয়েছেন এমনভাবে যে পাঠককে জ্ঞানটা যত কম কথা বলে দেয়া যায় তত ভালো। এই সব কৌশলের সরল বহিঃপ্রকাশ নিয়ে প্রথমে চিন্তিত ছিলাম, কিন্তু পরে মনে হয়েছে যে কৌশলই ব্যবহার করুন শেষ পর্যন্ত বইটি হাওর সম্পর্কে আমার ধারণাটিকে যেভাবে নাড়া দিল এটাই গুরুত্বপূর্ণ, কৌশলটি নয়।

এই উপন্যাসে যেমন তবারকের মতো কৃষক ও সফদরের মতো জেলেদের জীবন উঠে এসেছে, তেমনি উঠে এসেছে বালু শ্রমিকদের জীবন, ভাসান পানি আন্দোলনের সময়কার হারিয়ে যাওয়া জীবনের চিত্র, ডাক্তার-শিক্ষকদের জীবনের চিত্র। লেখক একই সাথে মনোযোগ দিয়েছেন ভিন্ন একটি শ্রেণির উত্থান-পতন ও রূপান্তরের চিত্র উপস্থাপনে, যেখানে এসেছে আয়নালের মতো ওয়াটারলর্ড ও আখেরের মতো দাদন ব্যবসায়ীর সামাজিক জীবনের আখ্যান। সব মিলে হাওর অঞ্চলের মানুষের জীবনের অস্থিরতার সংকট, লড়াইয়ের শক্তি, অস্থিতিশীল বৈরী পরিবেশে বেঁচে থাকার সংগ্রাম উঠে এসেছে প্রথমে ঘাসফুল নদী ও পরে চৈতন্য প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত এই উপন্যাসে।

আমাদের বর্তমান সময়ের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমস্যার প্রেক্ষিত আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগের সময়ের জীবনের চেয়ে অনেকটাই আলাদা। এর সাথে সাথে শ্রেনিবিন্যাসের পরিবর্তন, গ্রামীণ সমাজের রূপান্তর ও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতারও পরিবর্তন ঘটেছে। সাহিত্যের ধরাবাঁধা গণ্ডির ভেতর আগলে রেখে অস্পষ্টভাবে এই সূক্ষ্ম পরিবর্তনগুলোকে হাজির করলে যে চলে না, এর ভেতরে প্রবেশ করে এর সত্যকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করলে তার মধ্য দিয়েই যে একটি গল্প সাবলীলভাবে পাঠযোগ্য হয়ে হাজির হয় তার একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন মাসউদুল হক তাঁর ১৮৮ পৃষ্ঠার এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। গতানুগতিক ভাষার আতিশয্য ও অলংকরণের মোহ থেকে বের হয়ে এসে সরল ভাষায় মানুষের কাছে একটি জটিল গ্রামীণ সমাজকে নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রেখে উপস্থাপনের এই নজিরের জন্য উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে বেঁচে থাকবে বহুদিন।

মোশাহিদা সুলতানা: সহকারী অধ্যাপক, অ্যাকাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ইমেইল: moshahida@gmail.com